ভূমিকা

বিশের শতক বাঙালিজীবনে অনেক উজ্জ্বল মুহূর্তের ও ব্যক্তিত্বের জন্ম দিয়েছে। আজ একুশ শতকের তৃতীয় দশকে এসেও তাদের নিয়ে আমাদের নিয়ত চর্চা, অহঙ্কার ও প্রকাশন চলে। কিন্তু বিশের শতক বাঙালির জীবনে তার ইতিহাসের অন্ধকারতম এবং কঠিনতম লড়াইয়ের মুহূর্তগুলোকেও এনে দিয়েছে। জাতিদাঙ্গায়, কৃত্রিম মন্বন্তরে, আবেগদীপ্ত রাজনৈতিক আন্দোলনে অজস্র প্রাণ কেড়ে নিয়েছে তার। অথচ তা নিয়ে গভীরতর চর্চা পান্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাপত্রের বাইরে জনসাধারণের সাহিত্যে উপস্থিত থাকলেও নিতান্তই মুষ্টিমেয়। বিস্মৃতি একটি অভিশাপ। এবং পূর্বজের প্রতি অবিচারও বটে। কারণ যে অসম্ভব যন্ত্রণাদের নিয়ত সহ্য করে, দাঁতে দাঁত চাপা লড়াই করে তাঁরা আমাদের প্রজন্মকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, আমাদের শক্ত জমিতে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছেন, সেই যন্ত্রণা ও লড়াইদের স্মৃতিচারণ না করে, কেবলমাত্র অতীতের বৌদ্ধিক ও শৈল্পিক সাধনার স্তম্ভে পুজোর ফুল দিয়ে গেলে তা নিজের পূর্বপুরুষকেই অপমান করা হয়। এ উপন্যাস সেই স্মৃতিসন্ধানের এক দুর্বল প্রয়াস।

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য
বিধাননগর
ডিসেম্বর ২০২১

ঢাকা, ১৯৪২

"টেলিগ্রাম সার।"

একটু চমকে উঠে সুরথের দিকে ফিরে তাকালেন ডঃ সেন, "বিপিনবাবু?"

"আইজ্ঞা না সার। ব্যাঙ্কক না। পিয়ন কইল, ফুলতলি পোস্টাপিস থেইক্যা পাঠাইছে।"

একটু হতাশ হলেন ডঃ সেন। দিনসাতেক হল ব্যাঙ্ককে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের মিটিং শেষ হয়েছে। খবরের কাগজে অবশ্য যুদ্ধের বাজারে সে-সব সেন্সর করা হয়। তবে সরকারি সেন্সরশিপ এড়িয়ে দেশিয় সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার নেটওয়ার্ক বিপিনবাবুর রয়েছে। অথচ এখনো কোনো নির্দেশ...

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে টেলিগ্রামটা খুলে চোখ বুলিয়ে মুখটা হঠাৎ একটু শক্ত হয়ে উঠল ডঃ সেনের। সুরথ সতর্ক চোখে তাঁর দিকে দেখছিল। ত্রিশ বছর ধরে সঙ্গে আছে। পরিবারেরই একজন হয়ে গেছে সে এতগুলো বছরে। তাঁর সবকিছু জানে সে।

"খারাপ কিছু সার? সুরেনবাবুর বাড়ির সব কুশল তো?"

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন ডঃ সেন, "না রে সুরথ। ছেলেটার মা হঠাৎ..."

"কী হইছে তানার?" সুরথের মুখে উদ্বেগের একটা ছায়া এসে পড়েছে। সুমিত্রাকে জন্মের পর থেকে কোলেকাঁখে করে বড়ো করেছে সে। সেই স্নেহের ভাগ সুরেন্দ্রও পেতে শুরু করেছে এখন।

কী কথাবার্তা হয়েছিল তারপর দুটিতে, সে তিনি জানেন না। তবে সুরেন্দ্র তারপর ও-নিয়ে আর কোনো আপত্তি করেনি।

আপত্তি অবশ্য ডঃ সেনেরও ছিল। ওদের দুজনের পাশ করে ইন্টার্নশিপটা শেষ করে নেয়া অবধি অপেক্ষা করাটা উচিত হত হয়তো। কিন্তু সেই দেরিটুকু করতে আর তিনি ভরসা পাচ্ছেন না এখন। মার্চে বার্লিন রেডিয়োয় ভাষণ দিয়ে সুভাষচন্দ্র ফের জনসমক্ষে আসবার পর থেকেই এদেশে তাঁর শেকড়গুলো কাটবার জন্য বৃটিশদের তৎপরতা বেড়ে গেছে অনেকটাই।

ডঃ সেন টের পান তাঁর নিজের পেছনেও লোক লেগেছে। সন্দেহটা প্রমাণ করবার মত কিছু এখনো পায়নি তারা। তবে সেটা যেকোনো মুহূর্তে তাদের হাতে এসে যাওয়া অসম্ভব নয়। শীলাও সেটা জানে। কিছু একটা ঘটে যাবার আগেই ছেলেমেয়েদুটোকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখানে থেকে সরিয়ে দেয়াটা নিরাপদ, এ-ব্যাপারে তাঁরা দুজনেই একমত হয়েছেন। ঘরে আগুন লাগলে তা কাউকেই ছাড়বে না।

এলোমেলো চিন্তাগুলো করতে করতেই কাগজটা বের করে ফের একবার দেখলেন ডঃ সেন। নাঃ। মৃত্যুর কোনো ইঙ্গিত সেখানে নেই। তবে এ-অসুখ একবার ধরলে তার নিদান ডাক্তারিশাস্ত্রে নেই। বাঁচা মরা একেবারেই ঈশ্বরের হাতে। ডাক্তারি করতে করতে ভাগ্যের ওপর একটা অদ্ভুত নির্ভরতা এসে গেছে তাঁর এতদিনে। যার যাবার সে যাবেই। শত চিকিৎসাতেও তাকে রোখা যাবে না। আর আয়ু থাকলে বিনা চিকিৎসাতেও তো কত মানুষ...

নাঃ। ছেলেটা একটা ট্রেন পরে রওনা হলে তাতে ভদ্রমহিলার বিধিলিপিতে বিশেষ এদিক ওদিক হবে না। পরীক্ষাটা একেবারে মিটিয়ে পরের গাড়িটাই ধরুক বরং।

***

"কেমন হল?"

ক্লান্ত, তরুণ মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর গলা শুনে।

"ভালো হয়েছে স্যার," এতক্ষণের চাপা উত্তেজনাটা সরে গিয়েছে ছেলেটার মুখ থেকে। একটা তৃপ্তির হাসি ঝলমল করছিল সেখানে, "ডঃ বেনেট নিজেও তো আদতে ক্যান্সার স্পেশালিস্ট! তা ডঃ আলম সেই নিয়ে আমায় একটা প্রশ্ন করবার পর সেই যে ডিসকাশান শুরু হল, তারপর আর দ্বিতীয় কোনো সাবজেক্ট নিয়ে কথাই হয়নি। লণ্ডনের লেটেস্ট কিছু রিসার্চ নিয়ে যা খবর দিলেন তাতে সাবজেক্টটায় একটা রেভোলিউশান আসতে চলেছে স্যার..."

গলাখাঁকারি দিয়ে হঠাৎ তার কথাটা কেটে দিলেন ডঃ সেন, "কিন্তু এদিকে যে একটা বিপদ হয়েছে সুরেন্দ্র।"

উত্তেজিত কথার ঝোঁকটা থেমে গেছে ছেলেটার। জিজ্ঞাসু চোখে তাঁর দিকে ঘুরে তাকিয়েছে সে। ডঃ সেন নীরবে টেলিগ্রামটা তার হাতে তুলে দিলেন।

"দুপুরে এসেছিল। তুমি তখন পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ছিলে বলে আমি আমার কাছেই রেখে দিয়েছিলাম। টাইম টেবিল দেখে রেখেছি। আটটা কুড়িতে একটা প্যাসেঞ্জার আছে। তুমি বরং..."

কথাগুলো সুরেন্দ্রর কানে যাচ্ছিল না। হাতে ধরা কাগজের টুকরোটা থেকে শব্দগুলো যেন চোখে এসে বিঁধছে তার। সন্ন্যাসরোগ! তার মানে সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস। ধাক্কাটা সামলাতে পারবেন তো? ডাক্তার বলতে তো ওখানে সেই অমিকাকার কাঠের স্টেথো আর কার্মিনেটিভ মিক্সচার...

...টেলিগ্রামটা পাঠিয়েছেন রাধু কাকা। তাঁকে খবরটা দিল কে? যতীন কাকা কি? তাই হবে!

"সুরেন্দ্র!"

ডঃ সেন-এর স্নেহমেশানো ধমকটা তাকে ফের একবার বাস্তবে ফিরিয়ে নিয়ে এল। সস্নেহে তার হাত ধরেছেন তিনি, "এভাবে দাঁড়িয়ে ভাবলে কোনো ফল হবে কি? এস। হোস্টেলে যেতে হবে না এখন। বাড়িতে খবর পাঠিয়ে রেখেছি। তোমার কাকিমা খাবার বানিয়ে রেখেছেন। সুমিত্রারও ফেরা সময় হয়ে এল। গিয়ে স্নান করে ঠান্ডা হয়ে, দুটি মুখে দিয়ে তারপর ট্রেন ধরবে। আমি নাহয় কাউকে স্টেশনে পাঠিয়ে টিকিটটা..."

নীরবে মাথা নাড়ল সুরেন্দ্র। এখন তার একটু একলা থাকবার প্রয়োজন।

"আপনি ভাববেন না স্যার, দিনদুয়েক বাদে তো এমনিতেই বাড়ি ফেরবার কথা ছিল। ব্যাগপত্র গুছোনোই রয়েছে। ঘণ্টাদুয়েক সময় যখন পেয়েছি তখন বরং হোস্টেলে গিয়ে ওদিককার পাট গুটিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাব'খন।"

কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন ডঃ সেন। এই মুহূর্তে এর মনে ঠিক কী ঝড় চলছে তা অনুমান করে নেয়া তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। একসময় বাবাকে নিয়ে তিনি নিজেও সে-যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে পার হয়েছেন। বড়ো মুখচোরা ছেলে। নিজের সুখদুঃখ কারো সঙ্গে ভাগ করে নিতে শেখেনি। তাছাড়া, তেমন কোনো বন্ধুবান্ধবও নেই যে এ-সময়টা পাশে এসে দাঁড়ায়।

অবশ্য এ-ছেলের বন্ধুবান্ধব জোটাও মুশকিল। পড়াশোনার সময়টুকু বাদে সকাল বিকেল টিউশন করে একগাদা। সুমিত্রা অনেকবার বলেছে, শেষে না পারতে ডঃ সেনকে দিয়েও বলিয়েছে, কিন্তু ছেলের ওই এক গোঁ, "আপনার কাছে ঋণের তো আমার শেষ নেই স্যার। আপনি পাশে না দাঁড়ালে ডাক্তারি পড়বার স্বপ্ন আমার কোনোদিন পূরণ হত

না। কিন্তু আমার নিজের খরচটা অন্তত আমাকে নিজেকে জোগাড় করে নিতে দিন।” এতগুলো বছরে নাকি একটা সিনেমাও দেখতেও যায়নি কখনো।

***

“সুরেন্দ্র?”

শব্দটা কানে আসতে একটু থমকে দাঁড়াল সে। ডঃ সেনের রুম থেকে বেরিয়ে আসবার পর ভেবেছিল, সিধে না গিয়ে প্রেমচাঁদ রায় ওয়ার্ডের পেছনদিকটা দিয়ে ঘুরপথে হোস্টেলের দিকে চলে যাবে। এই মুহূর্তে সুমিত্রার মুখোমুখি হবার ইচ্ছে তার নেই। অথচ তার পা দুটো তাকে ঠিক এইখানে টেনে এনেছে। নিজের অজান্তেই।

লেডি ডাফরিন ওয়ার্ডের একেবারে মুখটাতেই সুমিত্রা দাঁড়িয়েছিল। ফাইনাল ইয়ার শুরু হয়েছে তার এখন। নিয়মমাফিক ক্লাশগুলোর পরেও ডাফরিন ওয়ার্ডে হাতেকলমে কয়েকটা সেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাদের ইয়ারের মেয়েদের। শেষ হতে হতে পাঁচটা বেজে যায়।

সুরেন্দ্রের পরীক্ষার দিনগুলো সুমিত্রা ক্লাশ শেষ হবার পরেও খানিকক্ষণ ডাফরিন ওয়ার্ডের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। কয়েকটা মুহূর্তের নিভৃত আলাপ। বাড়িতে সে সুযোগ বড়ো বেশি জোটে না তাদের। মা থাকেন, বাবা থাকেন। না, না সে বড়ো লজ্জার ব্যাপার।

“এই...”

থেমে দাঁড়ালো সুরেন্দ্র। আধো অন্ধকারের আব্রুটুকু আছে। তবু, সাহস করে মুখটা সে সুমিত্রার দিকে ঘোরাতে পারছিল না সেই মুহূর্তে।

মেয়েদের একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকে। কিছু একটা অনুভব করল হয়তো সুমিত্রা। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে, লজ্জার মাথা খেয়ে তার হাতটা ধরে বলল, “আমার দিকে দেখ! মুখ ঘোরাও...”

আর তারপর গলাটা ভারী নরম করে বলল, “ভাইভা ভালো হয়নি না? জানতাম, বুড়ো বেনেট...”

বলতে বলতেই হঠাৎ খানিক তরল গলায় সে বলে উঠল, “ও নিয়ে ভেবো না। তোমার খারাপ মানে তো আমাদের মত স্টুডেন্টের ডিস্টিংকশান। ও তুমি ঠিক উতরে যাবে। তুমি...এই...”

আস্তে আস্তে তার হাতটা সরিয়ে দিল সুরেন্দ্র। তারপর চোখদুটো মুছে নিয়ে নীচু গলায় বলল, “দুপুরে টেলি এসেছে। ডঃ সেন দিলেন। মা...”

হঠাৎ একেবারে চুপ করে গেল সুমিত্রা। এই সম্ভাবনাটার কথা তার মাথায় আসেনি